ইউনিট ৬

সমাজকল্যাণে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান

ভূমিকা

মানবসেবা মানুষের মধ্যে একটি সহজাত প্রবৃত্তি। অতীতকাল থেকেই ধর্মযাজকগণ, বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গ ও সমাজসংস্কারগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে ও প্রতিষ্ঠানিক পর্যায়ে সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। পরবর্তীতে সমাজে সৃষ্ট জটিল সমস্যা সমাধানে এইসব প্রতিষ্ঠান সংগঠিত করা হয়। বর্তমানে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে দরিদ্র, বেকারত্ব, অধিক জনসংখ্যা, পুষ্টিহীনতা, পরিবেশদুষণ নিরক্ষরতা ইত্যাদি নানাবিধ সমস্যা সমাধান সরকারের একার পক্ষে সম্ভব নয়। এসব ক্ষেত্রে সরকারের কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। বাংলাদেশে ১৯৭১ সালের যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতি পুর্নগঠনে বেশ কিছুসংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান হচ্ছে ব্রাক, বহসুত্র সমিতি, আশা, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, অপরাজেয় বাংলাদেশ, রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি, ওয়াল্ডভিশন, সুরভি ইত্যাদি। আন্তর্জাতিক পর্যায়ে বেশ কিছু সংখ্যক প্রতিষ্ঠান কাজ করে যাচ্ছে, এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে আইএলও, ফাও, ইউনিসেফ, ইউনেস্কো, ইউনিকল, অক্সাফার্ম, রাবেতা, কেয়ার বাংলাদেশ ইত্যাদি। বাংলাদেশে ক্রমান্বয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা দ্রুতবৃদ্ধি পাচ্ছে। সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মপরিধিও বৃদ্ধি পাচ্ছে। ত্রাণ ও পুর্নবাসন কাজ থেকে শুরু করে দারিদ্র বিমোচন, মাইক্রো ক্রেডিট, পল্লী উন্নয়ন, স্বাস্থ্যসেবা, জেন্ডার সমতা আনায়ন, পরিবেশ সংরক্ষণ, শিক্ষার বিস্তার, দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ, সামাজিক বনায়ন এবং আইনগত সহায়তা প্রদানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো সচেষ্ট। এর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সরকারী প্রতিষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে মানবিক সেবাদান জরুরী সমস্যা মোকাবেলা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা।

এই ইউনিটের মাধ্যমে বিভিন্ন পাঠে প্রথমতঃ বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশ দ্বিতীয়তঃ এর সংজ্ঞা, বৈশিষ্ট্য, শ্রেণীবিভাগ, তৃতীয়তঃ এর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা, চতুর্থতঃ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সুবিধাসমূহ এবং পঞ্চমতঃ এই সংস্থার অসুবিধাসমূহ আলোকপাত করা হয়েছে।

এই ইউনিটের পাঠগুলো হল -

পাঠ-৬.১ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশ
পাঠ-৬.২ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য
পাঠ-৬.৩ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও ভূমিকা
পাঠ-৬.৪ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সুবিধাসমূহ
পাঠ-৬.৫ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাসমূহ

পাঠ-৬.১ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি বলতে পারবেন-

☞ ৬.১ঃ১ বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও বৃদ্ধির পটভূমি ব্যাখ্যা করতে পারবেন

৬.১ঃ১

মানবসভ্যতা সৃষ্টি লগ্ন থেকেই মানুষ পরস্পরকে সাহায্য সহযোগিতা করে আসছে। ধর্মীয় মূল্যবোধ, মানবপ্রেম, সম্মান ও সামাজিক ও প্রতিপত্তির লাভের আকাঙ্খায় সর্বকালেই মানুষের মধ্যে সহজাত প্রবৃত্তি হিসেবে কাজ করেছে এবং সেই চেতনা থেকে বিভিন্ন ধরনের সেবামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। বিভিন্ন ধর্মযাজকগণ রাজন্য ব্যক্তিবর্গগণ, সমাজ সংস্কারগণ সমাজসেবামূলক কাজে এগিয়ে এসেছিলেন। এসব দান বা সাহায্য কখনো ব্যক্তি পর্যায়ে কখনো প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে কখনো অসংগঠিত কখনো সংগঠিত উপায়ে দেয়া হতো। কিন্তু শিল্প বিপ্লবের ফলে সৃষ্ট জটিল, মানবিক সামাজিক সমস্যাগুলো সেবামূলক ব্যবস্থা পর্যায়ক্রমে তা সংগঠিত উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ গ্রহণ করে এভাবে ধীরে ধীরে সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার কারণে স্বেচ্ছাসেবীমূলক প্রতিষ্ঠান সুসংগঠিত হয়ে বিকাশ লাভ করতে থাকে।

সাম্প্রতিক তৃতীয় বিশ্বের অনুন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা একটি সর্বাধিক পরিচিত প্রত্যয়। সত্তরের দশকে দরিদ্র অনুন্নত বিশ্বে সাহায্যদানের নতুন কৌশল হিসেবে আমেরিকা, বেসরকারি/স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গঠন করে। ১৯৭৩ সালে নাইরোবীতে বিশ্ব ব্যাংকের পরিচালকমন্ডলীর সভায় ভাষণ দিতে গিয়ে বিশ্ব ব্যাংকের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট রবার্ট ম্যাকনামারব সর্বপ্রথম এনজিও স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের নামে একটি বিকল্প গ্রামীণ প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন সৃষ্টির প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে তুলে ধরেন। তখন থেকে ম্যাকনামার নেতৃত্বে বিশ্ব ব্যাংক এবং অন্যান্য অর্থ যোগানদাতা সংস্থাগুলো এর নীতির স্বপক্ষে শক্তিশালী প্রচারণা চালাতে শুরু করে। এর সাথে এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক (এডিসি) সাহায্য সংস্থা সম্পর্কে নতুন দৃষ্টিভঙ্গি পোষণ করেন। এতে যে সত্যটি স্পষ্ট হয়ে উঠে তা হচ্ছে তৃতীয় বিশ্বের স্বল্পোন্নত ও দরিদ্র দেশগুলোতে যেহেতু সবসময়ই সামাজিক বিক্ষোভ, বিশৃঙ্খলা এবং রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা বিরাজমান থাকে, সেহেতু বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোকে আমলাতান্ত্রিক কাঠামোর বাইরে কাজ চালিয়ে যেতে হবে। অর্থ সাহায্য সংস্থাগুলোর নতুন মূল্যায়নের প্রেক্ষিতেই বিশ্বের দেশগুলোতে বেসরকারি সাহায্য সংস্থাগুলোর কার্যক্রম দ্রুতবৃদ্ধি পেতে থাকে।

বাংলাদেশে এ স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রমের সূচনা হয় ১৯৭০ সালের দিকে। এ সময় দেশের দক্ষিণাঞ্চলের প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার দুর্গত মানুষের সাহায্যার্থে বিদেশী সাহায্য সংস্থার আগমন ঘটে। বিদেশী সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের প্রাকৃতিক অবস্থান এবং দুর্গত মানুষের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে বাস্তব অভিজ্ঞতা অর্জন করে। এতে বিদেশী সাহায্য সংস্থার প্রতিনিধিরা বাংলাদেশের দুর্গত ও দরিদ্র মানুষকে সাহায্যার্থে এগিয়ে আসার অনুপ্রেরণা লাভ করে। এই হচ্ছে একটি প্রেক্ষিত।

অন্যদিকে ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ফলে অর্থনৈতিক কাঠামো ভেঙ্গে পড়ে। অর্থনীতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। আর্থ-সামাজিক কাঠামো বদলে যায়। সমাজ জীবনে দেখা দেয় ব্যাপক দরিদ্র। যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির পুনর্বাসনের জন্য ব্যাপক কার্যক্রম গ্রহণের প্রয়োজন দেখা দেয় যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশের যুদ্ধোত্তর পুনর্বাসনের জন্য কয়েকটি উদ্যেগী ব্যক্তি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার উদ্যেগ নেন। বর্তমানে এগুলো দেশের জাতীয় পর্যায়ে নেতৃস্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, কারিতাস, ক্রিশ্চিয়ান কমিশন ফর ডেভেলপমেন্ট ইন বাংলাদেশ (সিসিডিবি)। এরপর থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংখ্যা দ্রুতবৃদ্ধি পেতে থাকে। সংখ্যার বৃদ্ধির সাথে সাথে কর্মপরিধি বৃদ্ধি পায়। ত্রাণ ও পূর্ণবাসন কাজ থেকে শুরু করে দারিদ্র বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন, জেঞ্জার সমতা বিধান, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক বনায়ন, দল গঠন, ক্ষুদ্রঋণ, শিশুস্বাস্থ্য, নিরক্ষরতা দূরীকরণ, দক্ষতা ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এনজিওসমূহ সচেষ্ট।

এছাড়া ১৯৭১ সালের পর যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের ক্ষুদ্র বলয়ে কাজ শুরু করলেও বিদেশী তহবিলপুষ্ট বিভিন্ন এনজিও ত্রান, উন্নয়ন এবং সেবামূলক প্রকল্পের মাধ্যমে কর্মপরিধি বিস্তৃত করেছে। বাংলাদেশের এনজিওদের গুরুত্ব এবং ফান্ড বৃদ্ধির প্রেক্ষাপট হচ্ছে বাংলাদেশকে সাহায্যদাতা গ্রুপের ১৯৮৫ সালের প্যারিস কনসোর্টিয়াম। সেখানে উপলব্ধি করা হয় যে, বাংলাদেশে গণদরিদ্রের মূল কারণ সম্পদের উপর দরিদ্রতর জনগোষ্ঠীর অধিকারের অভাব। এক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর অধিকতর ভূমিকা নিশ্চিত করার সুপারিশ করা হয়েছে। অন্যদিকে সুইডিস প্রতিনিধিদলের নেতা লিনার্ট ডাফগার্ড বলেন, বাংলাদেশের দরিদ্রতম মানুষের প্রাপ্তিযোগ্য সম্পদের উপর অধিকার প্রতিষ্ঠা ও উন্নয়নেও তাদের অধিকার কার্যকর ভূমিকা নিশ্চিত করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা গ্রহণ করা উচিত। এক্ষেত্রে বেসরকারি সংস্থা কার্যকরী ভূমিকা রাখতে পারে। দক্ষতার প্রশিক্ষণ ও কার্যকরী গ্রুপ ও গোষ্ঠী গড়ে তোলা।

মূলত বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিকাশে ও কর্মতৎপরতা বৃদ্ধিতে এশীয় উন্নয়ন ব্যাংক (এডিবি), বিশ্বব্যাংক ও সাহায্যদাতা গ্রুপে বা উন্নয়ন অংশীদারদের বেসরকারি সংস্থার বিশেষভাবে কাজ করেছে।

এছাড়া বিগত দু'দশকে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান দ্রুত ও বিস্ময়কর বিকাশে ২টি বিশেষ ঘটনা কাজ করেছে। **প্রথমত,** বাংলাদেশে বিরাজমান দারিদ্র বিমোচনের ব্যাপক চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সরকারের গৃহীত উদ্যোগের সীমিত সাফল্য। ষাটের দশকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রবর্তিত কুমিল্লা পল্লী উন্নয়নের মডেলের ভিত্তি ছিল দু'স্তর বিশিষ্ট সমবায় পদ্ধতি যা বিশ্বের সকলের কাছে প্রশংসনীয় কিন্তু সরকার যখন এ কার্যক্রমকে পল্লী উন্নয়নের জন্যে গ্রহণ করল তখন দেখা গেল সমাজের বিত্তবানেরা সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ লাভ করল। উদ্ভূত ভূমিহীন ক্ষুদ্র কৃষকেরা বঞ্চিত হয়। উদ্ভূত পরিস্থিতির ফলে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলি পল্লী উন্নয়নের জন্যে দ্রুত প্রবেশের সুযোগ পেল। সুতরাং কৃষি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশের মত গুরুত্বপূর্ণ খাত এবং দরিদ্রদের জীবনে বাঞ্চিত উন্নয়নে সরকারি উদ্যোগের সীমাবদ্ধতা এনজিওদের/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানদের প্রবেশের সুযোগ সৃষ্টি করে দেয়।

দ্বিতীয়ত, দরিদ্রদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে কতিপয় এনজিও বিশেষ কার্যকারিতা প্রদর্শন করে এতে বেসরকারি স্বেচ্ছসেবী সংস্থাসমূহের মাধ্যমে বিদেশী সাহায্য প্রদানের জন্য বহুপক্ষিক ও দ্বিপাক্ষিক উন্নয়ন সহযোগিতা ক্রমবর্ধমান হারে আগ্রহী হয়ে উঠে।

উন্নত বাংলাদেশে এনজিও/স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহের আইনগত ও নিয়ন্ত্রণমূলক কাঠামো তৈরি হয় বৃটিশ আমলে। বর্তমানে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের জন্যে যে সব আইনগত কাঠামো রয়েছে -

- সমিতির নিবন্ধন আইন - ১৮৬১
- ট্রাস্ট আইন - ১৮৮২
- সমবায় সমিতি আইন - ১৯২৫
- স্বেচ্ছাসেবী আইন - ১৯১৩
- স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ - ১৯৬১
- বিদেশী অনুদান (স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম) নিয়ন্ত্রণ অধ্যাদেশ - ১৯৭৮
- বিদেশী চাঁদা (নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ - ১৯৮২

বিদেশী তহবিল লাভে ইচ্ছুক বিদেশী তহবিল গ্রহণ করে এমন সব স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ করার জন্য ১৯৯০ সালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে এনজিও বিষয়ক ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। উপরোল্লখিত আইনগত কাঠামোগত আওতায় বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে থাকে ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

সার-সংক্ষেপ

অতীতকাল থেকেই ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মানবিক চেতনা বোধ থেকেই মানবসেবামূলক কাজ করে যাচ্ছে। তৎকালীন সময়ে এসব সেবামূলক ব্যবস্থা ছিল অপর্যাপ্ত, অসংগঠিত ও ব্যক্তিগত পর্যায়ে। পরবর্তীতে আধুনিক সমাজে জটিল সমস্যা সমাধানে ও সময়ের পরিসরে তা সুসংগঠিত উপায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পায় এবং রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশে ১৯৭০ সালে প্রলয়ংকরী প্রাকৃতিক দুর্যোগের শিকার দুর্গত মানুষের সেবায় সর্বপ্রথম বিদেশী সংস্থাসমূহ এদেশে আসে এবং ১৯৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধত্তোর পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে পুনর্বাসনমূলক কর্মসূচী গ্রহণ করে। পরবর্তী পর্যায়ে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ও কর্মপরিধি বৃদ্ধি পেতে থাকে। বিশেষ করে দরিদ্রদের সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা ও দারিদ্র মোকাবেলায় চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করায় এর গুরুত্ব উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। স্বেচ্ছাসেবীমূলক কর্মতৎপরতাকে নিয়ন্ত্রণ তদারকীর ও জবাবদিহিতার জন্যে সরকার কর্তৃক বেশ কিছু আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এর মধ্যে ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা নিবন্ধন ও রেজিস্ট্রীকরণ অধ্যাদেশ উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশে উল্লেখযোগ্য জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো হচ্ছে, ব্রাক, আশা, অপরাজেয় বাংলাদেশ, বহুমূত্র সমিতি, রেডক্রিসেন্ট, শৈশব বাংলাদেশ, গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, স্বনির্ভর বাংলাদেশ ইত্যাদি।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.১

সত্য/মিথ্যা লিখুন

১. স্বাধীনতার পর যুদ্ধবিধ্বস্ত অর্থনীতির পুর্ণগঠন ও পুর্নবাসনের জন্যে জাতীয় পর্যায়ে কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সর্বপ্রথম কাজ শুরু করেছিল।

২. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণের জন্যে কোন আইনগত কাঠামো নেই।

৩. আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন নয় - শুধুমাত্র সুশীল সমাজ গঠনই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের একমাত্র লক্ষ্য।

৪. ১৯৬১ সালে "স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা (নিবন্ধন ও নিয়ন্ত্রণ) অধ্যাদেশ" প্রবর্তন করা হয়।

উত্তর - ১. সত্য ২. মিথ্যা ৩. মিথ্যা ৪. সত্য

সঠিক উত্তর পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বিশ্ব ব্যাংকের সাবেক প্রেসিডেন্ট ম্যাকনামারা কখন এনজিও গঠনের প্রথম প্রস্তাব করেন?

ক. ১৯৬৫ সালে খ. ১৯৭৩ সালে গ. ১৯৮০ সালে ঘ. ১৯৮৫ সালে

২. বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বিকাশে বিশেষভাবে কাজ করছে -

ক. এডিপি খ. ইউনিসেফ গ. জাইকা ঘ. সুইডিশ ব্যাংক।

উত্তর - ১. খ ২. ক

পাঠ-৬.২ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা, প্রকারভেদ ও বৈশিষ্ট্য

উদ্দেশ্য

এই পাঠ শেষে আপনি লিখতে পারবেন -

☞ ৬.২ঃ১ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা ও শ্রেণীবিভাগ দিতে পারবেন

☞ ৬.২ঃ২ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন।

ভূমিকা ঃ বিশ্বের দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশসমূহের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে বেসরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ এক গৌরবউজ্জ্বল ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। প্রথমেই জানতে হবে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বলতে সাধারণত কি বোঝায়।

৬.২ঃ১ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সংজ্ঞা

যখন কিছু সংখ্যক জনগণ স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে অভিন্ন উদ্দেশ্যে মেটানোর জন্যে নিজস্ব চাঁদা, সাহায্য বা সরকারি অনুদানের ভিত্তিতে কোন সংগঠন গড়ে তোলে এবং নিজেদের দ্বারাই তা পরিচালিত হয়ে থাকে তখন তাকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বলা হয়ে থাকে। সমাজকর্ম অভিধানের ব্যাখ্যানুযায়ী স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা হলো এমন সব সংগঠন, যেগুলোর তহবিল বেসরকারী উৎস থেকে সংগৃহীত এবং লক্ষ্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে সেবা প্রদান। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহের প্রবণতা হলো বিশেষ প্রয়োজন ও সমস্যা সমাধানে সেবাদান। সেবা প্রদানের বিশেষ ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে রয়েছে স্বাস্থ্য ও হাসপাতাল সেবা (যে সব বহুমূত্র সমিতি, বাংলাদেশ ক্যান্সার সোসাইটি, বাংলাদেশ যক্ষ্মা সমিতি) বিশেষ দল বা শ্রেণীকে সাহায্য করা (যেমন প্রবীণ হিতৈষী সংঘ, এতিমখানা)।

১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিবন্ধীকরণ ও নিয়ন্ত্রণ আইনে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে সংজ্ঞায়িত করে বলা হয়, স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা বলতে এমন এক সংগঠন, সমিতি বুঝায় যা বিভিন্ন এক বা একাধিক সেবাদানের ক্ষেত্রে সমাজকল্যাণমূলক সেবাকর্ম পরিচালনার উদ্দেশ্যে এবং জনগণের চাঁদা, সাহায্য বা সরকারি অনুদানের উপর নির্ভর করে জনগণ স্বেচ্ছায় প্রতিষ্ঠিত করে থাকে।

আমেরিকার জাতীয় সমাজকর্মী সমিতির মতে বেসরকারি সমাজকল্যাণ সংস্থা হলো এমন সব সংস্থা যা প্রথমত, নিজেদের দ্বারা গঠিত নীতিমালাকে সমাজকর্মের নীতিমালা হিসেবে গ্রহণ করবে, দ্বিতীয়ত, এসব নীতিমালায় আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ করবে সেখানে তা কার্যকর করতে আগ্রহী ও স্বেচ্ছায় উদ্ভূত লোকজন নিয়ে পরিচালনা পরিষদ গঠন করা হয়, তৃতীয়ত, তাদের আয়ের উৎস হবে সাধারণ লোকজনের সাহায্য, বিশেষ দান বা ব্যক্তির সাহায্য, চাঁদা এবং সরকারি অনুদান। চতুর্থত, বিশেষ কতগুলো উদ্দেশ্য নিয়ে নির্দিষ্ট এলাকায় এসব সংস্থা কাজ করবে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মূল উদ্দেশ্য হলো, সরকারি এজেন্সির পৃষ্ঠপোষকতার বাইরে মানবিক সেবা দান। জরুরী সমস্যা মোকাবেলা, আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন, সামাজিক পরিবর্তন ও উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করা। বাংলাদেশে কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ব্র্যাক, বহুমূত্র সমিতি, রেডক্রিসেন্ট সমিতি, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, আশা, অপরাজেয় বাংলাদেশ, ওয়াল্ড ভিশনের নাম উল্লেখযোগ্য।

৬.২ঃ২ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের প্রকারভেদ/শ্রেণীবিভাগ

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য সেবার ধরন, গঠন প্রকৃতি ও কর্মপরিধি অনুযায়ী কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যায়।

১. উদ্দেশ্যগতভাবে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থা দু'ধরনের। তাহলো একমুখী সংস্থা ও বহুমুখী সংস্থা। একমুখী সংস্থা মুখ্যতঃ একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে গড়ে উঠে আর বহুমুখী সংস্থা গঠিত হয় বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে।

২. সেবাদানের প্রকৃতির আলোকেও স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাসমূহকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। এক্ষেত্রে যে সংস্থা সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে ব্যক্তি ও দলের কল্যাণ সাধনে রত তাকে বলে প্রত্যক্ষ সংস্থা আর যেসব সংস্থা পরোক্ষভাবে সেবা কার্যক্রম পরিচালনা করে তাকে বলে পরোক্ষ সংস্থা।

৩. প্রখ্যাত সমাজবিজ্ঞানী W.B Friedlander স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে নিম্নোক্ত চারভাগে ভাগ করেছেন-

(ক) প্রত্যক্ষ ব্যক্তিগত বা দলীয়ভাবে সমাজসেবা দানকারী সংস্থা। এগুলোকে মুখ্য (Primany) সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান বলা হয়ে থাকে। যেমন, এতিমখানা, বয়স্কাউট, গালর্স গাইড।

(খ) পরোক্ষ সমাজসেবা দানকারী প্রতিষ্ঠান। এগুলোকে গৌণ সমাজ সেবা (Secondary) প্রতিষ্ঠান বলা হয়। যেমন, জাতীয় সমাজকল্যাণ পরিষদ, শিশুকল্যাণ পরিষদ, মহিলা পরিষদ।

(গ) যে সব প্রতিষ্ঠান অন্যান্য কার্যক্রমের সাথে সমাজসেবা প্রদানকে সহায়ক কার্যক্রম হিসেবে গ্রহণ করেছে, যেমন- রোগী কল্যাণ সমিতি, সামাজিক গবেষণা কেন্দ্র।

(ঘ) প্রত্যক্ষ সমাজসেবা প্রদানের বাইরে ও অন্যান্য সমাজকল্যাণ কার্যাবলি পরিচালনা করে থাকে যেমন - বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা সমিতি, বাংলাদেশ রেডক্রিসেন্ট সোসাইটি।

৪. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ডাইরেক্টরীতে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে ৪ ভাগে ভাগ করেছে।

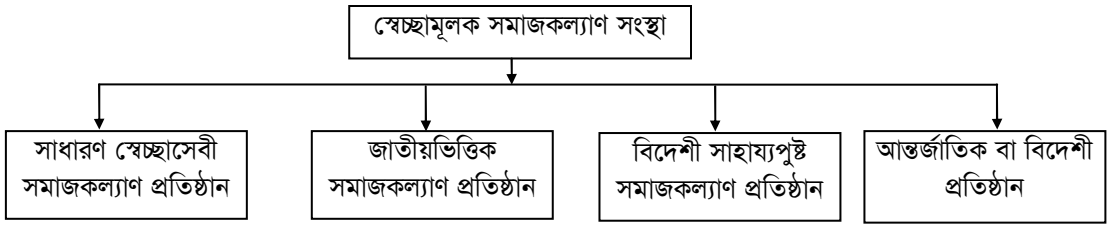

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উপরোক্ত শ্রেণীবিভাগ ছাড়া বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সাংগঠনিক বিন্যাস উৎপত্তি ও কর্মদারা ও কর্মপরিধি অনুযায়ী আমরা নিম্নক্তোর ৩ ভাগে ভাগ করতে পারি।

(ক) **আন্তর্জাতিক বেসরকারি সংস্থা ঃ** বিদেশী অর্থে ও বিদেশী বিশেষজ্ঞ এবং নাগরিকদের এ শ্রেণীর অন্তর্গত। পরিচালিত ব্যবস্থাপনায় কর্মরত এনজিওগুলো এ শ্রেণীর অন্তর্গত। এসব উন্নয়ন সংস্থার মাঠ পর্যায়ে দেশীয় কর্মচারী রয়েছে। বাংলাদেশে কর্মরত আন্তর্জাতিক এনজিওগুলোর নিজ দেশে প্রধান অফিস অবস্থিত। তবে অনেকগুলো ঢাকা কেন্দ্রীয় অফিস ও ঢাকার বাইরে আঞ্চলিক ও মাঠ পর্যায়ের অফিস রয়েছে। এসব সংস্থার উদাহরণ হলো- কেয়ার বাংলাদেশ, সেভ দ্যা চিলড্রেন ফেডারেশন (যুক্তরাষ্ট্র), সেভ দ্যা চিলড্রেন ফান্ড (যুক্তরাজ্য), টেরোজোস হোমস্ (ফ্রান্স, সুইজারল্যান্ড, নেদারল্যান্ড) ইত্যাদি।

(খ) **জাতীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঃ** বাংলাদেশের গ্রামীণ এলাকায় উপার্জনশীল কর্মসংস্থান ও মানব সম্পদ উন্নয়নমুখী কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত এবং দেশীয় বিশেষজ্ঞ ও নাগরিকদের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় পরিচালিত সংস্থা এ শ্রেণীভুক্ত। এসব জাতীয় সংস্থার মধ্যে রয়েছে ব্র্যাক, গ্রামীণ ব্যাংক (স্বায়ত্ত শাসিত সংস্থা) গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র, নিজেরা করি, কারিতাস বাংলাদেশ ইত্যাদি।

(গ) **স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ঃ** বাংলাদেশে বিভিন্ন এলাকায় শিক্ষা স্বাস্থ্য, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ, দারিদ্র্য বিমোচন ইত্যাদি খাতে সেবামূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নে নিয়োজিত সংস্থাগুলো এ শ্রেণীভুক্ত। সরকারি অনুদান জনগণের আর্থিক ও কারিগরী সাহায্যে এসব সংস্থা বিভিন্ন জেলা বা থানা পর্যায়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। এসব এনজিওর উদাহরণ হলো ভিলেজ এ্যাডুকেশন রিসোর্স সেন্টার, শৈশব বাংলাদেশ, গণ উন্নয়ন প্রচেষ্টা, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট সার্ভিস, নারী মৈত্রী ইত্যাদি।

৬.২ঃ৩ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বৈশিষ্ট্যসমূহ

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উৎপত্তি কার্যক্রম ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ করলে নিম্নোক্ত কতিপয় বৈশিষ্ট্যসমূহ স্পষ্ট হয়ে থাকে-

১. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মূল ভিত্তি হলো ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় অনুশাসন, মানবিক, দায়িত্ববোধ এবং সামাজিক চেতনাবোধ থেকে এর উৎপত্তি।

২. জনগণের নিজস্ব উদ্যোগে এই সংস্থা গড়ে উঠে এবং নিজস্ব লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নিজেদের দ্বারাই অনেকাংশে করে থাকে।

৩. এটি একটি অমুনাফাকারী অলাভজনক প্রতিষ্ঠান। জনস্বার্থে ও মানবিক সেবা প্রদানই এর প্রধান উদ্দেশ্য।

৪. জনগণের স্বেচ্ছা দান, চাঁদা, সরকারি অনুদান, বিভিন্ন ট্রাষ্ট এবং ব্যক্তি মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ও বহুজাতিক কোম্পানীগুলোর আর্থিক আনুকুল্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার আর্থিক তহবিল গড়ে উঠে।

৫. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কম-বেশী স্বশাসিত। দরিদ্র ও উন্নয়নশীল দেশের সরকারি প্রশাসনিক কাঠামোর বাইরে সংশ্লিষ্ট আইনের আওতাধীন থেকে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে। যা কিনা সরকারি সংস্থাগুলো পারে না।

৬. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা কার্যকরী পরিষদ দ্বারা পরিচালিত হয়ে থাকে। গঠনতন্ত্র বিধিমালা ও কর্মসূচী সহজেই পরিবর্তন ও সংশোধন করা যায়। অর্থাৎ নমনীয় প্রকৃতির।

৭. স্বেচ্ছাসেবী কাঠামো সরকারি সংস্থার ন্যায় ততটা জটিল নয় বিধায় পরিবর্তিত অবস্থার সাথে সামঞ্জস্য রেখে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে। যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জরুরী ভিত্তিতে সেবাদান করে থাকে।

৮. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, টার্গেট গ্রুপ নির্দিষ্ট করে, টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সাহায্য ও পুর্নবাসন কার্যাবলি পরিচালনা করে।

৯. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি বৈশিষ্ট্য হলো পরীক্ষামূলকভাবে কর্মসূচী গ্রহণ করা যায় কিনা সরকারি সংস্থার পক্ষে একেবারেই অসম্ভব। পরীক্ষামূলক কর্মসূচীটি সফল হলে তা সরকারি কর্মসূচীর পথ প্রদর্শক হিসেবে অনুসৃত হয়।

১০. দাতা সংস্থার প্রতিষ্ঠান বা ট্রাষ্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে বেতনভুক্ত কর্মী বাহিনীর মাধ্যমে বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কার্যাবলি পরিচালিত হয়। প্রশাসনে বহিঃস্থ নিয়ন্ত্রণ সীমিত।

১১. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার হিসাবরক্ষণ ও নিরীক্ষণের জন্য যৌথভাবে নীতিমালা নির্ধারণ করা হয়। অর্থাৎ নিজেদের অডিট ব্যবস্থার সাথে সাথে সরকারি অডিট হয়ে থাকে।

সার-সংক্ষেপ

স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে কিছু সংখ্যক লোক একত্রিত হয়ে নিজেদের চাদা, অনুদান বা সরকারী প্রতিষ্ঠানের সহযোগীতায় নিজেদের গঠিত তহবিলের মাধ্যমে নিজস্ব উদ্দেশ্যে বা চাহিদা পুরণের লক্ষ্যে কোন সংগঠন গড়ে তোলে। এই সংস্থার মূল দার্শনিক ভিত্তি হলো মানব সেবা প্রদানে নিজস্ব উদ্যেগে এবং অলাভজনক একটি প্রতিষ্ঠান। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সার্বজনীন কোন শ্রেণীবিন্যাস নেই। উদ্দেশ্য ও সেবার ধরন অনুযায়ী কেউ কেউ শ্রেণী বিভাগ করেছেন। তবে সাধারণত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাকে তিনভাগে ভাগ করা যায় তা হচ্ছে (ক) আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (খ) জাতীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ও (গ) স্থানীয় পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.২

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মূল ভিত্তি ধর্মীয় চেতনাবোধ ———— ও ———— থেকে এর উৎপত্তি।

২. এটি একটি ———— ———— প্রতিষ্ঠান।

৩. ———— ———— মাধ্যমে সাধারণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান।

৪. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ডাইরেক্টরীতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে ———— ভাগ করেছে।

** শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য মূল পাঠ দেখুন।

সঠিক উত্তর পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. উদ্দেশ্যগতভাবে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান কয় ধরণের-

ক. ২ খ. ৩ গ. ৪ ঘ. ৫

২. স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠান ডাইরেক্টরীতে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থাকে কয় ভাগে ভাগ করা হয়েছে -

ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬

৩. কোনটি আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা নয়?

ক. কেয়ার বাংলাদেশ খ. সেফ দ্যা সিলড্রেন

গ. টেয়োজোন হোমস (ফ্রান্স) ঘ. ব্র্যাক

উত্তরমালা - ১. ক. ২ ২. খ. ৪ ৩. ঘ. ব্র্যাক

পাঠ-৬.৩ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব ও ভূমিকা

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে ব্যাখ্যা দিতে পারবেন

☞ ৬.৩ঃ১ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব/ভূমিকা

☞ ৬.৩ঃ২ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্র/পরিধি

৬.৩ঃ১ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব/ভূমিকা

ভূমিকা ঃ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত সমাজকল্যাণ ও সমাজকর্মের ঐতিহাসিক পটভূমি আলোচনা করলে দেখা যায় যে, স্বেচ্ছামূলক সমাজকল্যাণ সংস্থার কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়েই আধুনিক সমাজকল্যাণের উদ্ভব। আধুনিক সমাজে সৃষ্ট বিভিন্ন জটিল সামাজিক ও বহুমাত্রিকতার প্রেক্ষিতে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দেশে যেখানে দারিদ্র্য বেকারত্ব অধিক জনসংখ্যা, পুষ্টিহীনতা, পরিবেশ দুষণ, নিরক্ষরতা ইত্যাদি হাজারো রকমের সমস্যা বিদ্যমান রয়েছে সেখানে সরকারি কার্যক্রমের পাশাপাশি স্বেচ্ছাসেবী সমাজ কল্যাণ সংস্থাসমূহ পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। নিম্নে স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থার গুরুত্ব/ভূমিকা আলোচনা করা হলো।

১. **সরকারি কর্মসূচীর পরিপূরক ঃ** দারিদ্র্য পীড়িত ও সীমিত শক্তি সামর্থ্যের অধিকারী বৃহৎ জনগোষ্ঠীর সমস্যা মোকাবিলায় এককভাবে সরকারি ব্যবস্থা গ্রহণ সম্ভব হয়ে উঠে না। সম্পদের সীমাবদ্ধতার কারণে সরকারি কর্মসূচি অনেক ক্ষেত্রে সমস্যা সমাধানে অপর্যাপ্ত বলে প্রতীয়মান হয়। এসব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো সরকারি কর্মসূচির সহায়ক এবং পরিপূরক হিসেবে ভূমিকা পালন করে। যেমন- বাংলাদেশের পরিবার পরিকল্পনা সমিতি ও স্বেচ্ছাবন্ধাকরণ সমিতি, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সরকারি কর্মসূচীর সহায়ক ও পরিপূরক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

২. **জটিল ও জরুরী সমস্যা মোকাবিলায় ঃ** স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক জটিলতা অনমনীয়তা, দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি সরকারি সংস্থার তুলনায় অনেক কম থাকে। ফলে পরিবর্তিত চাহিদা প্রয়োজন এবং সমস্যার প্রেক্ষিতে কর্মসূচি গ্রহণ ও পরিবর্তন সহজ হয়। আকস্মিক বিপর্যয়ে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা অতি ক্ষুদ্র ও তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে বিপর্যয় কাটিয়ে উঠতে সাহায্য করে। কোন এলাকার বিভিন্ন ধরনের জরুরী সমস্যা যেমন, প্রাকৃতিক দুর্যোগ দাঙ্গা-হাঙ্গামা, মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলে তা মোকাবিলায় স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা অনস্বীকার্য। প্রাকৃতিক দুর্যোগকালীন সময়ে দুর্গত এলাকায় সরকারি সাহায্য পৌঁছার পূর্বে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কার্যক্রম শুরু হয়ে যায়। কারণ সরকারি পক্ষের সিদ্ধান্ত গ্রহণ সাহায্য সামগ্রী গ্রহণ ও যাতায়াত ইত্যাদি ব্যাপরে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে শ্রম ও সময়ের বাহুলতা প্রয়োজন মত/জরুরী ভিত্তিতে জনগণের সাহায্য লাভের সুযোগকে অনিশ্চিত করে তোলে। কিন্তু এক্ষেত্রে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা পালনে জটিলতা না থাকায় তা সহজেই জনগণের কাছে পৌঁছে যায়।

৩. **সরকারি কর্মসূচির পথিকৃত ঃ** স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো প্রশাসনিক কাঠামো নমনীয় বিধায় পরীক্ষামূলক প্রকল্প ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে জাতীয় জীবনে এগুলোর গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরে। এসব পরীক্ষামূলক কর্মসূচীর সাফল্য এবং গুরুত্ব উপলব্ধি করে সরকারী পর্যায়ে সেগুলো গ্রহণ করা হয়। যেমন, ১৯৫৬ সাল থেকে ১৯৬৫ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে পরিকল্পনা কর্মসূচী বাস্তবায়নের পর তা সরকারি পর্যায়ে গ্রহণ করা হয়। কুমিল্লা পল্লী উন্নয়ন পদ্ধতির অনুসরণে জাতীয় পর্যায়ে পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ও দ্বিস্তর বিশিষ্ট সমবায় গৃহীত হয়।

৪. **এলাকাভিত্তিক স্থানীয় সমস্যার স্বার্থক মোকাবিলা ঃ** স্থানীয় ভিত্তিক স্থানীয় এলাকার সমস্যা যত সহজে মোকাবিলা করা সম্ভব কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচিত কোন তৎপরতার মাধ্যমে এসব সমস্যা তত সহজে মোকাবেলা করা যায় না। কেননা স্থানীয় সমস্যা চিহ্নিতকরণ, জনগণের অংশ গ্রহণের মাধ্যমে পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন স্থানীয় সম্পদের সুষ্ঠু সদ্ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদি ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ব্যবস্থার চেয়ে স্থানীয় ব্যবস্থা অধিকতর কার্যকর। আর এ ব্যাপারে স্বেচছাসেবী প্রতিষ্ঠানই স্বতঃস্ফূর্ত উদ্যেগের মাধ্যমে অর্থবহ ভূমিকা পালন করে এলাকাভিত্তিক স্থানীয় সমস্যার সার্থক মোকাবিলা করতে সফল হয়।

৫. **মানব সম্পদ উন্নয়নে ও অনির্ভরশীল অর্জনে সহায়তা ঃ** দক্ষ মানব সম্পদ, আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের অপরিহার্য উপাদান। আর মানব সম্পদ উন্নয়নের কার্যকর হাতিয়ার হলো শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও সমাজসেবা কার্যক্রম। মানব সম্পদ

উন্নয়নের সঙ্গে সম্পৃক্ত শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, স্বাস্থ্য পরিবার কল্যাণ, নারী ও শিশু উন্নয়ন সমাজকল্যাণ যুব উন্নয়ন প্রভৃতি এনজিওগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাছাড়া জনগণের নিজের প্রয়োজনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে তার শক্তি সামর্থ্যের বিকাশ সাধনপূর্বক আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে।

৬. **সামাজিক আইন প্রণয়নের সরকারে দৃষ্টি আকর্ষণ ঃ** সমাজে প্রচলিত ক্ষতিকর প্রথা, রীতি-নীতি, মূল্যবোধ, আচার আচরণ দূর করার জন্য জনমত গঠনে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে।

সামাজিক পরিবর্তন আনয়নে সমাজ সংস্কার সামাজিক কার্যক্রম এবং সামাজিক আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। যেমন, সংসদে নারীর আসন বৃদ্ধির ক্ষেত্রে, বাংলাদেশের মহিলা সংগঠনগুলো কার্যকর ভূমিকা রাখছে। তেমনিভাবে সতিদাহ প্রথা উচ্ছেদ বাল্যবিবাহ নিরোধ, বিধবা বিবাহ প্রচলনের ক্ষেত্রে জনগণকে সচেতনতা প্রদান ও সক্রিয় করার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবীমূলক প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট ভূমিকা পালন করে থাকে। তাছাড়া যৌতুক নিরোধ আইন প্রণয়নে ও শিশু ও নারী নির্যাতন দমন আইন প্রণয়নে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

৭. **পৃথক পৃথকভাবে জনগোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষণে গুরুত্ব ঃ** কোন দেশের সরকার বিশেষ কোন দল বা গোষ্ঠী স্বার্থকে বিবেচনা করে সেবাকার্যক্রম গ্রহণ করে না। ফলে সরকারি কর্মসূচীতে সাধারণত কোন বিশেষ এলাকা বা গোষ্ঠীর স্বার্থ সংরক্ষিত থাকে না। এরূপ পর্যায়ে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহই নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন মোতাবেক স্বার্থ সংরক্ষণ করে বিশেষভাবে তাদের কল্যাণ নিশ্চিত করতে পারে।

৮. **জাতীয় উন্নয়নে জনগণের অংশ গ্রহণ নিশ্চিতকরণ ঃ** জাতীয় উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে জনগণকে জড়িত করতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সক্রিয় ভূমিকা রাখতে পারে। কেননা এ ধরনের সংস্থার জনগণ স্বেচ্ছায় ঐক্যবদ্ধ হয় ও স্বতস্ফুর্তভাবে উন্নয়নমূলক প্রচেষ্টা গ্রহণ করে। সংস্থার এ ধরনের প্রচেষ্টার সাথে জাতীয় উন্নয়ন প্রচেষ্টার সম্পর্ক বন্ধন রচনা করলে তা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

৯. **কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে ঃ** স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো দু'ভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। প্রথমতঃ বড় বড় দেশী-বিদেশী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো নিজেদের কর্মী নিয়োগের মাধ্যমে বিরাট সংখ্যক শিক্ষিত বেকারের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। বাংলাদেশে বিদেশী অর্থে পরিচালিত সংস্থাগুলোতে হাজার হাজার কর্মী নিয়োজিত রয়েছে। দ্বিতীয়তঃ টার্গেট গ্রুপগুলো বিভিন্ন বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ দান ও ঋণ বিতরণের মাধ্যমে স্ব-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে। এভাবে বেকার সমস্যা সমাধানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

১০. **দারিদ্র্য বিমোচন ঃ** স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো দরিদ্র ও ভূমিহীনদের টার্গেট গ্রুপ হিসেবে চিহ্নিত করে তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের প্রচেষ্টা চালায়। দারিদ্র্য বিমোচনে সরকারি প্রচেষ্টার সম্পূরক হিসেবে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। গ্রামীণ ব্যাংক, স্বনির্ভর বাংলাদেশ, প্রশিকা, ব্রাক প্রভৃতি সংস্থাগুলো দরিদ্র বিমোচনে সাফল্যে অর্জন করেছে। গ্রামীণ দরিদ্রদের লক্ষ্যভুক্ত দল হিসেবে চিহ্নিত করে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ সরবরাহ করে উৎপাদনমুখী স্ব-কর্মসংস্থানের প্রচেষ্টা চালায়।

১১. **শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ঃ** উপানুষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নিরক্ষরতা বাংলাদেশ গড়ার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক অভূতপূর্ব সাফল্য অর্জন করেছে। উপানুষ্ঠান শিক্ষা কার্যক্রম ধারণা ও পাঠ্যক্রম তৈরীতে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা ব্রাকের অবদান বিশ্বব্যাপী। প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, নারীর প্রজনন স্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে, শিশুদের টীকাদান শিশু ও প্রসূতি মৃত্যুহার রোধ বিশেষ করে কলেরা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে খাবার স্যালাইন তৈরীকরণ ও সচেতনার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্কার গুরুত্ব অপরিসীম। এক্ষেত্রে ব্র্যাকের ভূমিকা সত্যিই প্রশংসার দাবীদার। পরিবেশ বিপর্যয় এর ব্যাপারে জনগণের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি এবং সামাজিক বনায়ন এর মাধ্যমে পরিবেশ পুনরুদ্ধার ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া পল্লী উন্নয়ন ও জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা সুদীর্ঘকালের।

বিশ্বব্যাংক কয়েক বছর ধরে এনজিও এর ভূমিকা বিশ্লেষণ করে এনজিওকে গুরুত্বপূর্ণ বলে উল্লেখ করেছে। বিশ্বব্যাংকের মতে যেসব ক্ষেত্রে এনজিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা হলো নিম্নরূপ -

১. টার্গেট গ্রুপ এ্যাপ্রোচ ভিন্ন ভিন্ন ভাবে সংঘটিত উৎপাদনশীল একককে অভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক পটভূমি থেকে আগত দরিদ্রদের ঐক্যবদ্ধ করে এবং তাদেরকে বর্তমান গ্রামীণ ক্ষমতা কাঠামো পুনরুজ্জীবিত করবার কাঠামো অনেক কার্যকরভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ ও নিজেদের কর্মসূচী বাস্তবায়নের সুযোগ দেয়।
২. বর্তমানে অনেক গতানুগতিক গ্রামীণ পেশা আছে যেগুলো কর্মসংস্থান, আয় উপার্জনকারী, সুযোগ সৃষ্টি করে, ঋণের ব্যবস্থা করে। এসব সুযোগকে সংগঠিত করার জন্য প্রশিক্ষণ এবং বাজারজাতকরণের সুবিধাদি প্রদান করা যায়।
৩. যথাযথ সামাজিক ও প্রযুক্তিগত তত্ত্বধান এবং গ্রুপ গতিশীলতা ঋণ পরিশোধের উচ্চহার গ্রামীণ ব্যাংকিং ব্যবস্থাকে যথাযোগ্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত করতে পারে।
৪. অর্থকরী শৃঙ্খলাকে বজায় রাখার জন্য দরিদ্ররাও সঞ্চয় করতে পারে।
৫. দরিদ্রদের নিয়ে কাজ করতে হলে আরও নমনীয় নিরীক্ষামূলক লেগে থাকা কর্মসূচী ভিত্তিক, সাংগঠনিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা দরকার। এনজিও তা করতে চেষ্টা করছে।
৬. স্থানীয় চাহিদায় সাড়া দেয়া হচ্ছে।

৬.৩ঃ২ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কর্ম পরিধি/কর্মক্ষেত্রে (Field and Scope of Voluntary Agencies in Bangladesh) ঃ

বাংলাদেশের মত অনগ্রসর ও ব্যাপক দারিদ্র্য কবলিত দেশের দারিদ্র্য নিরসন, অকৃষি খাতে আয়বৃদ্ধি, জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বেকারত্ব দূরীকরণের মতো সমস্যা মোকাবিলায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা ব্যাপকভাবে স্বীকৃত। বাংলাদেমে এনজিওগুলো বর্তমানে কোন কোন ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে তা নির্দেশ করে বিশ্বব্যাংক কয়েকটি দিক উল্লেখ করেন। এগুলো নিম্নরূপ-

- জনগণ ও সরকারি মহলের সচেতনতা সৃষ্টি
- আধুনিক পদ্ধদিতে শিক্ষাদান
- সাধারণ পদ্ধতির সম্প্রসারণ সেবা
- দুর্যোগের অগ্রিম খবর দান
- দুর্যোগকালীন ও উত্তরোত্তর ত্রাণ তৎপরতা ও পুর্নবাসন
- মানবাধিকার সংরক্ষণ ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা প্রদান
- গরীবদের প্রাতিষ্ঠানিক ঋণ দেয়ার ব্যাপারে পরীক্ষা-নিরীক্ষা
- ভূমিহীনদের জন্য হস্তশিল্প উন্নয়ন
- স্বকর্মসংস্থান সৃষ্টি
- লাগসই প্রযুক্তির বিস্তার
- কৃষি গবেষণা সম্প্রসারণ

অন্যদিকে ১৯৬১ সালে প্রবর্তিত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা (রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ) আইন প্রবর্তিত হওয়ার পর এদেশে সু-শৃঙ্খল ও সুষ্ঠুভাবে বেসরকারি সমাজসেবা কর্মকান্ড গড়ে তোলার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। আমাদের দেশে জাতীয় সমাজ কল্যাণ পরিষদ যেসব ক্ষেত্রে স্বেচ্ছামূলক সংস্থাকে তালিকাভুক্ত হওয়ার যোগ্য হিসেবে বিবেচনা করার সুপারিশ করেছে। তা হলো নিম্নরূপ -

১. শিশুকল্যাণ
২. যুব কল্যাণ
৩. নারী কল্যাণ
৪. শারীরিক ও মানসিক পঙ্গু কল্যাণ
৫. পরিবার পরিকল্পনা
৬. জনগণকে অসামাজিক কাজ থেকে বিরত করে এমন বিনোদন কার্যক্রম
৭. জনগণকে দায়িত্বশীল করে তোলার জন্য পরিচালিত সামাজিক শিক্ষা
৮. মুক্তি প্রাপ্ত কয়েদী পুনর্বাসন ও কল্যাণ
৯. কিশোর অপরাধী কল্যাণ
১০. দুঃস্থ ভিক্ষুক পুনর্বাসন

১১. সামাজিক পঙ্গু পুনর্বাসন
১২. রোগী পুনর্বাসন ও কল্যাণ
১৩. বৃদ্ধকল্যাণ
১৪. সমাজকর্ম প্রশিক্ষণ
১৫. সমাজ সেবা সংস্থার সমন্বয় ইত্যাদি।

সুবিধাভোগী হিসেবে দরিদ্র নারীদের লক্ষ্যভুক্তকরণ ঃ বাংলাদেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী হওয়া সত্ত্বেও আর্থ-সামাজিক দিক থেকে অনগ্রসর। বাংলাদেশের এনজিওগুলো অনগ্রসর দরিদ্র নারী শ্রেণীকে সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে উদ্ভাবনার প্রধান সুবিধাভোগী শ্রেণী হিসেবে নারীদের লক্ষ্যভুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশ এনজিও ব্যুরোর নিবন্ধনকৃত সকল এনজিওর লক্ষ্যভুক্ত, জনগোষ্ঠীর অর্ধেকের বেশী নারী। ব্রাক, আশা, প্রশিকা, পল্লী কর্ম ফাউন্ডেশন, গ্রামীণ ব্যাংক ইত্যাদি সংস্থাসমূহের বেশীরভাগ সুবিধাবাদী সদস্য হচ্ছে নারী। দারিদ্র্য বিমোচনে নারীদের উপর এনজিও কর্মসূচীর গুরুত্ব নারীর দৈহিক ও অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি করেছে, যা আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের শক্তিশালী মাধ্যম হিসেবে নারীর সম্ভবনাকে তুলে ধরেছে। নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি ও মনোভাবের ধনাত্মক পরিবর্তন ঘটেছে। নারীর ক্ষমতায়ন ও উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় এনজিও -এর অবদান সবচেয়ে বেশী।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা সরকারী সমাজ কল্যাণ সংস্থার পরিপূরক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে সরকারী সংস্থার তুলনায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা প্রশংসনীয়। যেমন- ডায়রিয়া প্রতিরোধে খাবার স্যালাইন, বহুমুত্র রোগ নিরাময়ে, পরিবার-পরিকল্পনা পদ্ধতি গ্রহণে উদ্বুদ্ধকরণ সর্বোপরি প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবেলার ক্ষেত্রে এদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাই মুখ্য ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে। সরকারের আর্থিক সীমাবদ্ধতা, প্রশাসনিক জটিলতার অনমনীয়তা এবং দীর্ঘসুত্রিতার কারণে যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী বাস্তবায়নের অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়। এ ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার উল্লেখিত সীমাবদ্ধতা কম বিদ্যমান থাকায় যে কোন উন্নয়নমূলক কর্মসূচী অতি সহজে বাস্তবায়ন করতে পারে। বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা দারিদ্র বিমোচন, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প, কর্মসংস্থান সৃষ্টি, দক্ষ মানব সম্পদ সৃষ্টি, উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা, স্বাস্থ্যসেবা, পরিবেশ সংরক্ষণ, মানবাধিকার সংরক্ষণ ও আইন সম্পর্কে সচেতনতা এবং দুর্যোগকালীন ত্রাণ তৎপরতা ও পুর্নবাসনের মাধ্যমে এদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৩

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সরকারী কর্মসূচীর ——— ও ——— ভূমিকা পালন করে।
২. প্রাকৃতিক দুর্যোগে ——— ——— ——— সরকারী সংস্থার চেয়ে অতি দ্রুত কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করে থাকে।
৩. ——— ও ——— স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা এক অভূতপূর্ব সাফল্য স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান অর্জন করেছে।
৪. যে কোন ——— কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে।

** শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য মূল পাঠ দেখুন।

সঠিক উত্তর পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. কোনটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার গুরুত্বের মধ্যে পরে না -
   ক. জটিল ও জরুরী সমস্যা মোকাবেলা খ. সরকারি কর্মসূচীর পথিকৃত
   গ. কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি ঘ. সমাজ সংস্কার
২. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা রেজিস্ট্রেশন ও নিয়ন্ত্রণ আইন কখন প্রবর্তিত হয়-
   ক. ১৯৫১ খ. ১৯৬১ গ. ১৯৬৫ ঘ. ১৯৭৯
৩. স্বেচ্ছামূলক সংস্থা তালিকাভুক্তির জন্য কোন শর্তটি প্রয়োজন নেই -
   ক. নারী কল্যাণ খ. দৃঃস্থ ভিক্ষুক পুনর্বাসন গ. সন্ত্রাস দমন ঘ. পরিবার পরিকল্পনা।

উত্তরমালা - ১. ঘ. সমাজ সংস্কার ২. খ. ১৯৬১ ৩. গ. সন্ত্রাস দমন

পাঠ-৬.৪ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সুবিধাসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি লিখতে পারবেন -

☞ ৬.৪ঃ১ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মকান্ড পরিচালনার ক্ষেত্রে কি কি সুবিধা রয়েছে তা ব্যাখ্যা দিতে পারবেন।

৬.৪ঃ১

ভূমিকাঃ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোতে আমরা দেখতে পাই যে, সরকারি সংস্থাগুলোর জন্য যে কাজটা অসুবিধাজনক তা বেসরকারি সংস্থাগুলো অতি সহজেই করতে পারে অর্থাৎ সুবিধাজনক। কেননা স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো যে কোন পরিস্থিতিকেই মোকাবিলা করতে পারে। তাছাড়া আমাদের মত দরিদ্রতম দেশে সীমিত সম্পদের দ্বারা বহুমুখী জটিল সমস্যা সমাধান সরকারের একার পক্ষে কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। স্বাধীনতা যুদ্ধের পর ১৯৭২ সালে যুদ্ধ বিধ্বস্ত দেশটির পুনর্বাসনের জন্যে কয়েকটি সংস্থা এগিয়ে আসে। বর্তমানে তার সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়ে কর্ম পরিধি আরো বিস্তৃতি লাভ করে। ত্রাণ ও পুনর্বাসন কাজ থেকে শুরু করে দারিদ্র্য বিমোচন, পল্লী উন্নয়ন, জেন্ডার সমতা বিধান, পরিবেশ রক্ষা, সামাজিক বনায়ন,দল গঠন, ক্ষুদ্র ঋণ, মা ও শিশু স্বাস্থ্য, নিরক্ষরতা দূরীকরণ দক্ষ ও উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রভৃতি আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। সরকারি কর্মসূচীর পরিপূরক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সবচেয়ে বড় সুবিধা।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সুবিধাসমূহ ঃ

নিম্নে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সুবিধাসমূহ আলোচনা করা হলো -

১. **সেবামূলক মনোবৃত্তি ঃ** যেহেতু বেসরকারি সংস্থা নিজেদের প্রচেষ্টায় নিজেদের ইচ্ছায় সমাজে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে আসে সেজন্য তাদের মধ্যে সেবামূলক মনোবৃত্তি থাকে। অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে জনগণকে সেবা করার উদ্দেশ্য তাঁরা সচেষ্ট থাকে। সরকারি সংস্থার অফিসারদের মত তাদের সেবার মনোবৃত্তির তুলনায় আমলাতান্ত্রিক মনোভাব বেশী থাকে না।

২. **নমনীয়তা ঃ** বেসরকারী সংস্থা সমাজের পরিবর্তিত চাহিদার সাথে সামঞ্জস্য বিধানের ক্ষেত্রে নিজস্ব নীতি কর্মসূচী সেবার ধরণ সহজে পরিবর্তন সাধন করতে পারে। তাছাড়া স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলোতে প্রশাসনিক জটিলতা, অনমনীয়তা, দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি সরকারি সংস্থার তুলনায় অনেক কম থাকে। ফলে পরিবর্তিত চাহিদা প্রয়োজন ও সমস্যার প্রেক্ষিতে কর্মসূচীর পরিবর্তন পরিমার্জন ও সংশোধন অতি সহজে করা যায়। তাছাড়া জরুরী ভিত্তিতে যখন যে খাতে যে টাকা প্রয়োজন হয অথবা তা ব্যয় করা সম্ভব হয় যা কিনা সরকারি সংস্থায় কখনো সম্ভব নয়।

৩. **জরুরী সমস্যার সমাধান ঃ** আকস্মিক বিপর্যয় বা বিভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় যেমন- বন্যা সাইক্লোন, জলোচ্ছাস মহামারী ইত্যাদি দেখা দিলেই তা মোকাবিলায় বেসরকারি সংস্থা অতি দ্রুততার সাথে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারে, যা কিনা সরকারি সংস্থার প্রশাসনিক জটিলতা সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বের কারণে সাহায্য সহযোগিতা পৌঁছাতে অনেক দেরী হয়ে যায় তখন হয়তো জনগণের ততটা সাহায্য প্রয়োজন থাকে না। এসব জরুরী সাহায্য প্রদানে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার তড়িৎ গতিতে সিদ্ধান্ত নিয়ে সেবা প্রদানে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে।

৪. **নির্দিষ্ট এলাকার সমস্যার সমাধান ঃ** সরকারি সংস্থা কোনো এলাকায় বিশেষ বিশেষ সমস্যা সমাধান দিতে পারে। সরকার সাধারণত জাতীয় সমস্যা সমাধানে অগ্রণী ভূমিকা পালন করে থাকে। কিন্তু স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষে স্থানীয় এলাকাভিত্তিক চাহিদা পূরণে ও সমস্যা সমাধানে অতি সহজেই করা সম্ভব হয়ে থাকে। স্থানীয় সমস্যার চিহ্নিতকরণ জনগণের অংশ গ্রহণ, পরিকল্পনা গ্রহণ, বাস্তবায়ন স্থানীয় সম্পদের সৃষ্ট ব্যবহার নিশ্চিতকরণ ইত্যাদির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার ভূমিকা উল্লেখযোগ্য।

৫. **ব্যক্তি কেন্দ্রিক ও ছোট খাটো সমস্যা মোকাবিলায় ঃ** সমাজ জীবনে এমন কিছু সমস্যা আছে যার দ্বারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী আক্রান্ত হয়নি কিংবা সমাজে তা ব্যাপক আকার ধারণ করেনি। এসব ছোট খাটো সমস্যা মোকাবিলা করা সরকারের চেয়ে স্থানীয়ভাবে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা অধিকতর ভূমিকা পালন করতে পারে।

৬. **সরকারি ব্যর্থতা ও সীমাবদ্ধতার গুরুত্ব ঃ** অনেক সময় দেখা যে, প্রশাসনিক জটিলতা, দুর্নীতি সিদ্ধান্ত গ্রহণে দীর্ঘসূত্রিতা ইত্যাদি কারণে জনগণ সরকারি সেবামূলক তৎপরতার উপর আস্থা হারিয়ে ফেলে ও অনিহা প্রকাশ করে থাকে। এরূপ পর্যায়ে জনগণও সরকারি কর্মসূচীকে অংশ গ্রহণ করে না বলে তা বাস্তবায়ন অসম্ভব হয়ে পড়ে।

স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ এমন পরিস্থিতিতে সেবামূলক তৎপরতা চালু করে জনগণের আর্থ-সামাজিক সমস্যা মোকাবিলায় সহায়তা করতে পারে।

৭. **আত্মনির্ভরশীল হতে সাহায্য করা ঃ** বেসরকারি সংস্থা জনগণের সহযোগিতা ও সমর্থনের মাধ্যমে গড়ে উঠে। তাই তারা জনগণকে খুব কাছাকাছি থেকে দেখার সুযোগ পায় ব্যক্তির চাহিদা কি, সম্পদ কি রয়েছে তার কি কি ক্ষমতা ও দক্ষতা রয়েছে ইত্যাদি বিচার বিশ্লেষণ করে ব্যক্তির সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের মাধ্যমে তাকে আত্মনির্ভরশীল করে তোলে।

৮. **পরীক্ষামূলক কর্মসূচী গ্রহণ ঃ** আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের জন্যে কোন মডেলটি অধিক উপযোগী হবে বা কোন কর্মসূচীটি জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে তা নির্ণয় করার জন্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নিরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণযোগ্য হবে তা নির্ণয় করার জন্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাসমূহ নিরীক্ষামূলকভাবে বিভিন্ন প্রকল্প গ্রহণ করে। বাস্তবে মাঠ পর্যায়ে উক্ত প্রকল্পের ত্রুটি বিচ্যুতি চিহ্নিতকরণ ও তা সংশোধন করে এবং তা যদি উন্নয়নে কার্যকর/ফলদায়ক হয় তাহলে সরকার সেই কর্মসূচী উন্নয়নের জন্যে গ্রহণ করে থাকে। আর স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার পক্ষেই একাজটি করা সম্ভব কারণ বেসরকারি সংস্থা জনগণের আস্থা হারাবার ভয়ে এ ধরনের পরীক্ষামূলক কোন কর্মসূচী গ্রহণ করে না।

৯. **দলভিত্তিক সমাবেশ ঘটানো এবং সুবিধাভোগীদের অংশ গ্রহণ ঃ** স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ যেভাবে দরিদ্রদের নিকটবর্তী হয়, দারিদ্র্য বিমোচনে তা একটি গুরুত্বপূর্ণ ও উদ্ভাবনা হিসেবে স্বীকৃত। গ্রুপ ভিত্তিক সমাবেশ ঘটানোর উদ্যেগের ফলে প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নির্ধারণ ও সুবিধাভোগীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ হয়। অন্যদিকে দরিদ্রদের আরো স্বাবলম্বী হতে সহায়তা করার জন্য, তাদের সাংগঠনিক ক্ষমতা জোরদারের মাধ্যমে সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়নের উদ্দেশ্য পূরণ হয়। গ্রুপভিত্তিক আর্থিক শৃঙ্খলা জোরদার ও দায়িত্ব সচেতনতা সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র্য বিমোচনে গৃহীত ঋণ কর্মসূচীর সাফল্য নিশ্চিত করার কার্যকর উপাদান লক্ষ্যভুক্ত, দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটানো তাদের উৎপাদন স্বত্ব বৃদ্ধির সাথে ক্ষমতায়ন সৃষ্টি ও সচেতনতার সৃষ্টির ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান অতি সহজেই করতে পারে এবং জনগণের কাছে অতি সহজেই গ্রহণযোগ্যতা অর্জন করতে পারবে।

সার-সংক্ষেপ

স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কিছু কিছু ক্ষেত্রে কাজ করতে বা কার্যক্রম পরিচালনা করতে সরকারি প্রতিষ্ঠানের তুলনায় অনেক সুবিধা রয়েছে। বিশেষ করে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সাথে জড়িত ব্যক্তিদের মধ্যে সেবা প্রদানের মানসিকতা বিদ্যমান থাকে। তাছাড়া সরকারী প্রতিষ্ঠানের মত প্রশাসনিক জটিলতা ও দীর্ঘসূত্রিতা থাকে না বিধায় যে কোন পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে জরুরীভাবে কর্মসূচী প্রণয়ন ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ মোকাবিলা অতি সহজে করতে পারে। বিশেষ করে সরকারের পক্ষে স্থানীয় সমস্যার চিহ্নিতকরণ এবং তা মোকাবেলা করা একেবারেই অসম্ভব সেখানে স্বেচ্ছামূলক প্রতিষ্ঠান স্থানীয় সম্পদের গতিশীলতার মাধ্যমে স্থানীয় চাহিদা পূরণপূর্বক জনগণকে আত্মনির্ভরশীল করে গড়ে তোলে। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বড় সাফল্যে উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডের জন্যে কোন কার্যক্রম সঠিক হবে বা কোন মডেলটি এদেশের জনগণের জন্যে উপযোগী হবে তার জন্যে পরীক্ষামূলকভাবে কর্মসূচী পরিচালনা করা যা কিনা সরকারের পক্ষে একেবারেই সম্ভব নয়। সর্বোপরি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান জনগণের কাছে অতি সহজেই গ্রহণযোগ্য তা অর্জন করতে পারে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন ৬.৪

সত্য/মিথ্যা লিখুন

১. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা উদ্যেগীদের মধ্যে সেবামূলক মনোবৃত্তির অভাব পরিলক্ষিত হয়।

২. সরকারী সংস্থার তুলনায় এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছে নমনীয় প্রকৃতির।

৩. দারিদ্র বিমোচনে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ কার্যকর উদ্ভাবন হলো গ্রুপভিত্তিক বা লক্ষ্যভুক্ত জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ঘটানো।

৪. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সবসময়ই জাতীয় ভিত্তিক চাহিদা ও সমস্যা মোকাবিলা করে থাকে।

উত্তর - ১. মিথ্যা ২. সত্য ৩. সত্য ৪. মিথ্যা

পাঠ-৬.৫ ঃ বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাসমূহ

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে লিখতে পারবেন -

☞ **৬.৫ঃ১** স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার কি কি সমস্যা রয়েছে বর্ণনা করতে পারবেন।

৬.৫ঃ১

ভূমিকা ঃ আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এবং বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের ক্ষেত্রে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বাস্তবে বিভিন্ন ধরনের সমস্যা অনভিপ্রেত অবস্থা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঠিক ভূমিকা পালনে ব্যঘাত ঘটায়। এক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টিকারী উল্লেখযোগ্য সমস্যাসমূহ নিম্নে সংক্ষেপে আলোচনা করা হল ঃ

১. **অর্থের অভাব ঃ** আমাদের দেশে অর্থাভাব স্বেচ্ছাসেবীমূলক প্রতিষ্ঠানের জন্য একটি মারাত্মক সমস্যা। অধিকাংশ স্বেচ্ছাসেবীমূলক প্রতিষ্ঠান জনগণের চাঁদা বা উপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু এসব উৎস থেকে যে সব অর্থ পাওয়া যায় তা প্রয়োজনের জন্য যথেষ্ট নয়। এছাড়া বাইরের থেকে যে অনুদান পাওয়া যায় সেক্ষেত্রে রয়েছে বিভিন্ন জটিলতা। আর্থিক সহায়তা প্রাপ্তি দীর্ঘসূত্রিতা ও প্রক্রিয়াগত বিলম্বের কারণে তা সময়মত পাওয়া যায় না। তাই স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্মসূচী কার্যকরী বাস্তবায়নে বাধা গ্রস্থ হয়ে পড়ে।

২. **স্থায়ীত্বের অভাব ঃ** বিভিন্ন কারণে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার স্থায়ীত্ব কম। কারণ জনগণের দানের মাধ্যমে গড়ে উঠে তাই এখানে আর্থিক সংকট থেকেই যায়। অন্যদিকে নেতৃত্বের অভাব নানা রকম দলীয়কোন্দল, বিনাবেতনভুক্ত, কর্মকর্তা ও কমচারীদের চাকুরীর অনিশ্চয়তা, বিভিন্ন ধরনের অনিয়ম ও দুর্নীতির কারণে এসকল সংস্থার স্থায়ীত্ব কম। জনগণ এখানে প্রথমে অনেক উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে কাজ করে পরে দেখা যায় পূর্বেকার মত উৎসাহ উদ্দীপনা আর থাকে না। তাই উৎসাহ উদ্দীপনার উদ্যেক্তাদের মধ্যে কতক্ষণ পর্যন্ত থাকবে তার উপরে নির্ভর করে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের স্থায়ীত্ব।

৩. **সুদক্ষ কর্মীর অভাব ঃ** আধুনিক জটিল সমাজে সমস্যা মোকাবিলার জন্য গৃহীত কার্যক্রম সুষ্ঠু পরিচালনে দক্ষকর্মী নিয়োগ করা দরকার। কিন্তু যেহেতু নিজেদের প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে তাই তারা নিজেদের মাধ্যমে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করে থাকে। ফলে তারা সরকারি সংস্থার মত বাছাইকৃতভাবে সুদক্ষ কর্মী নিয়োগ করতে পারে না এর ফরে কর্মসূচী বাস্তবায়নে অনেক সমস্যা দেখা দেয় এবং অনেক কাজ ব্যাহত হয়ে থাকে।

৪. **যুগোপযোগী কর্মসূচী গ্রহণে অক্ষমতা ঃ** যে কোন সংস্থার সার্থকতা নির্ভর করে গতিশীল কর্মকান্ডের উপর। কিন্তু আমাদের দেশের বেশীরভাগ স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা জনগণের মৌল সমস্যার উপর গুরুত্ব না দিয়ে গৌণ সমস্যা সমাধানে এগিয়ে আসছে। অর্থাৎ জনগণের অনুভূত চাহিদা কি, সমাজের সমস্যাগুলি কি, সম্ভাব্য সম্পদ কি রয়েছে, জনগণকে কিভাবে আত্মনির্ভরশীল হিসেবে গড়ে তোলা যাবে সেদিকে কম গুরুত্ব দিয়ে থাকে। যেমন, উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, শিশুদের মৌলিক মানবিক চাহিদার উপর গুরুত্ব না দিয়ে শিশুদের চিত্তবিনোদন, সাহিত্য খেলাধুলার উপর গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে। অবশ্যই শিশুদের বিনোদনের প্রয়োজন রয়েছে কিন্তু তার পূর্বে তাদের খাদ্যের, আশ্রয়ের নিরাপত্তা দিতে হবে। এভাবে বাস্তব বিবর্জিত কর্মসূচী স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গৌরবজ্জ্বোল ভূমিকাকে নিষ্ক্রিয় করে তুলছে।

৫. **সরকারি সহযোগিতার অভাব ঃ** স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে কার্যকর ও অর্থবহ করে তোলার জন্য সরকারের সমর্থন, সহযোগীতা, আর্থিক অনুদান ও কারিগরী সাহায্যের প্রয়োজন। কিন্তু প্রায় সকল দেশেই স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ তৎপরতাকে বৈষয়িক ও কারিগরী সাহায্যদানের সরকারের অনুৎসাহ দেখা যায়। সরকারের এরূপ উদাসীনতা স্বেচ্ছামূলক সমাজ কল্যাণের উদ্ভব ও বিকাশের অন্তরায়। ফলে মানব জীবনের বৃহত্তর পরিধিতে সুসংগঠিত সেবা লাভের সুযোগ সীমিত হয়ে পড়ে।

৬. **সমন্বয়ের অভাব ঃ** বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে অপরিকল্পিত ও বিচ্ছিন্নভাবে গড়ে উঠছে। ফলশ্রুতিতে একই কর্মসূচী বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গ্রহণ করছে ফলে কর্মসূচীর দ্বৈততা, আর্থিক অপচয়, সময়ের অপচয় হচ্ছে। অন্যদিকে বহুমাত্রিক জটিল সমস্যা সমাধানে একাধিক কর্মসূচী গ্রহণ করা সম্ভব হচ্ছে না। এরূপ পর্যায়ে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের মাঝে সমন্বয় সাধন সম্ভব হলে কাজের দ্বৈততা ও অপচয়রোধ করে কার্যকারিতা বাড়ানো সম্ভব হতো।

৭. **গবেষণা ও মূল্যায়নের অভাব ঃ** স্বেচ্ছাসেবীমূলক সংস্থাসমূহ কর্তৃক পরিচালিত সেবা কার্যক্রমের কার্যকারিতা মূল্যায়নের সামগ্রিক কোন ব্যবস্থা নেই। বেসরকারি সংস্থাকে কিভাবে অধিকতর জনকল্যাণের স্বার্থে কাজে লাগানো যায় এ ব্যাপারে সরকারি কোন গবেষণা হয় না। তাই বেসরকারি সংস্থাসমূহের লক্ষ্যার্জনে সফলতা নিরূপণ হচ্ছে না, সবলতা ও দূর্বলতা চিহ্নিত করা যাচ্ছে না। বাংলাদেশে বিশাল স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পর্যবেক্ষণ মূল্যায়ন ও সমন্বয় সাধনে প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থার কার্যকারিতার অভাব অত্যন্ত প্রকট।

৮. **বিদেশী তহবিলের ব্যয়ের বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংকীর্ণতা ঃ** বাংলাদেশের অল্প কিছু সংখ্যক স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বিদেশী তহবিল প্রদানের ধারা অব্যাহত রয়েছে। এক হিসেবে দেখা গিয়েছে যে বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানে মোট যে পরিমাণ বিদেশী তহবিল সরবরাহ করা হয় তার শতকরা ৮০ ভাগ পাচ্ছে ৩০টি বড় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান। আবার এগুলোর মধ্যে ৮টি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান প্রাপ্ত তহবিলে শতকরা ৬০ ভাগ নিয়ন্ত্রণ করছে। বিদেশী তহবিলের এরূপ বণ্টনের প্রভাবে বড় বড় স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানগুলো দ্রুত বিকাশ লাভ করলে স্থানীয় উদ্ভাবনশীল ছোট ছোট প্রতিষ্ঠানগুলোর বিকাশ বাধাগ্রস্থ হচ্ছে। তাছাড়া এই বরাদ্দের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক প্রভাবমুক্ত নয়।

৯. **ক্ষুদ্র ঋণ মডেলের সীমাবদ্ধতা ঃ** গবেষক ও বিশ্লেষকগণ স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের দারিদ্র্য বিমোচনে ক্ষুদ্র ঋণ মডেলের কার্যকারিতা নিয়ে সন্দেহ পোষণ করেছেন। জাতিসংঘের এক রিপোর্টে বলা হয়েছে ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থা বিশ্বের কোথাও দারিদ্র্য বিমোচনে সফল হতে পারেনি। ক্ষুদ্র ঋণ ব্যবস্থার সুতিকাগার খোদ বাংলাদেশে দারিদ্র্য বিমোচনে এই মডেলের কার্যকর ভূমিকা তেমন পরিলক্ষিত হয়নি। গরিব জনগণের মধ্যে ক্ষুদ্রঋণ এবং অন্য সাহায্যের ব্যবস্থা করে তাদেরকে কিছুটা সুবিধা দেয়া। সেই সুবিধার দ্বারা গরিবরা নিজের জিয়েল মাছের মত স্বল্প পানিতে বেঁচে থাকার মত অবস্থায় থাকে কিন্তু তাদের মধ্যে নিজেদের অবস্থার বড় ধরনের বা মৌলিক পরিবর্তন সৃষ্টির মত কোন চেতনা সৃষ্টি হয় না। ক্ষুদ্র ঋণের মাধ্যমে উন্নতর জীবন বা উচ্চতর শ্রেণীতে উত্তরণ সম্ভব নয়। সুতরাং বলা যায় ক্ষুদ্র ঋণ দরিদ্র বিমোচনের একমাত্র সমাধান নয়।

১০. **আইনগত সীমাবদ্ধতা ও জটিলতা ঃ** বাংলাদেশের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলোর কর্মতৎপরতার জন্য বিভিন্ন অধ্যাদেশ আইন ও বিধি বিধান প্রণীত হয়েছে। যেমন ১৮৬১ সালের সমিতি নিবন্ধন আইন, ১৮৮২ সালের ট্রাষ্ট আইন, ১৯১৩ সালের কোম্পানী আইন, ১৯৬১ সালের স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা নিয়ন্ত্রণ আইন, ১৯৭৮ সালের বিদেশী সাহায্য অধ্যাদেশ প্রভৃতি। এসব আইনের কোনটিতেই বেসরকারী সংস্থার বৈধতা নেই। এসব আইনগুলোসমর্থনমূলক না হয়ে অধিক নিয়ন্ত্রণ মুখী এবং বিধি নিষেধমূলক। এসব আইনে অনেক অসংগতি রয়েছে। স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলো কাজের সুবিধার্থে প্রচলিত অধ্যাদেশ আইন ও বিধি সংশোধন ও পরিবর্তন করে উপযুক্ত আইন কাঠামো গঠন করা প্রয়োজন।

১১. **দূর্নীতি ঃ** স্বেচ্ছাসেবী সমাজকল্যাণ সংস্থায় দূর্নীতি অর্থ-আত্মাৎ ও অনাচার দেখা দিয়ে থাকে। সরকারি সংস্থার মত কঠিন নিয়মকানুন হিসাব রক্ষণাবেক্ষন হয় না বিধায় এসব প্রতিষ্ঠানে স্বেচ্ছাচারিতার সুযোগ অনেক বেশী থাকে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা যায় এসব প্রতিষ্ঠানে আর্থিক দূর্নীতির কুচক্রীর, অনুপ্রবেশ ক্ষমতার অপব্যবহার ও সম্পদের আত্মাৎ ঘটে থাকে।

১২. **নেতৃত্বের অভাব ঃ** বলিষ্ঠ গতিশীল নেতৃত্ব যেমন প্রতিষ্ঠানকে সফলতার শীর্ষ শিখরে পৌঁছে দিতে পারে তেমনি দূর্বল ও অযোগ্য নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠানের ভাগ্যে বিপর্যয় ডেকে আনতে পারে। প্রায়শ দেখা যায় স্বেচ্ছাসেবী সংস্থায় পদমর্যাদা ও স্বার্থ নিয়ে নেতৃত্বের সংকট দেখা যায়। যেহেতু সরকারি সংস্থার মধ্যে সকলের ভূমিকা পদমর্যাদা, কর্মবিভাজন আইনের মাধ্যমে নির্ধারিত থাকে না তাই এসব নিয়ে নিজেদের মধ্যে অসন্তোষ দ্বন্দ্ব ও সংঘাতের সৃষ্টি হয়ে থাকে- যা কিনা অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচীকে ব্যাহত করে এবং এর অস্তিত্ব হুমকীর সম্মুখীন হয়ে থাকে।

১৩. **রাজনৈতিক কর্মকান্ডে অংশায়ন ঃ** বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহ দরিদ্রদের ক্ষমতায়ন, তাদের প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন ও সম্পদের সুষম বণ্টনকে দারিদ্র্য বিমোচনের অত্যাবশ্যকীয় কৌশল হিসেবে গ্রহণ করেছে। এরূপ কৌশল দরিদ্রদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অংশগ্রহণকে নিশ্চিত করবে বলে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান মনে করে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই তৃণমূল পর্যায়ে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে রাজনৈতিকভাবে দেশের কোন একটি দলের আদর্শের পক্ষে অবস্থান করে এবং জনগণকে প্রভাবিত করতে চেষ্টা করছে। এ ধরনের পূর্বে ততটা ছিল না, কিন্তু বর্তমানে এ ধরনের মানসিকতা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে বিভিন্নভাবে সমালোচিত করছে।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশে আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হয়। স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হচ্ছে প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব। প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এই প্রতিষ্ঠান কার্যক্রমের ধারাবাহিকতা ও স্থায়ীত্ব রাখতে পারে না। অন্যদিকে সরকারের পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সমর্থন সহযোগিতা আর্থিক অনুদান ও কারিগরী সাহায্য পাচ্ছে না। ফলশ্রুতিতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বিকাশ ও বৃদ্ধি অনেকাংশে বাধাপ্রাপ্ত হচ্ছে। আন্তর্জাতিক তহবিল সংগ্রহ ক্রমান্বয়ে জটিল পদ্ধতি ও বরাদ্দের সংকীর্ণতা সৃষ্টি হওয়াতে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানকে আরো বেশী আর্থিক সীমাবদ্ধতার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। তাছাড়া বর্তমানে স্বেচ্ছাসেবীমূলক প্রতিষ্ঠানকে নানাবিধ অনিয়ম, আর্থিক দূর্নীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তার সম্পর্কিত জনমনে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। এবং বিতর্কিত হচ্ছে - যা কিনা স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের দার্শনিক ভিত্তি মানবপ্রেম ও সেবামূলক মনোবৃত্তির বিকাশ এবং জবাবদিহিতার ক্ষেত্রে বিরাট অন্তরায়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন-৬.৫

শূন্যস্থান পূরণ করুন

১. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার .... একটি বড় সমস্যা।

২. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার মধ্যকার ..... এর অভাব রয়েছে।

৩. .... প্রাপ্তির ক্ষেত্রে দারুন পদ্ধতিগত জটিলতা রয়েছে।

** শূন্যস্থান পূরণ করার জন্য মূল পাঠ দেখুন।

সঠিক উত্তর পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. স্বেচ্ছামূলক সমাজসেবী সংস্থার অন্যতম মারাত্মক সমস্যা কি?

ক. সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা খ. অর্থের অভাব

গ. সন্ত্রাস ঘ. ধর্মীয় কু-সংস্কার

২. স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার বিদেশী সাহায্য আইন কখন পাস হয়?

ক. ১৮৭৮ খ. ১৮৮২

গ. ১৯৬৮ ঘ. ১৯৭৮

উত্তর - ১. খ. অর্থের অভাব ২. ঘ. ১৯৭৮

ইউনিট-৬

অনুশীলনী

রচনাবলী প্রশ্ন / রচনা উত্তরের প্রশ্ন

১. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সংজ্ঞা দিন। বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে আলোচনা করুন।

২. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী? এর শ্রেণী বিভাগগুলি বর্ণনা করুন।

৩. বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের গুরুত্ব/ভূমিকা আলোচনা করুন।

৪. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝায়? বাংলাদেশে স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহের কর্মপরিধি/কর্মক্ষেত্রসমূহ আলোচনা করুন।

৫. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যগুলো কী? এর সুবিধাসমূহ আলোচনা করুন।

৬. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাগুলি/সীমাবদ্ধতাগুলো সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

সংক্ষিপ্ত উত্তর-প্রশ্ন

১. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান বলতে কি বুঝেন? এর সংজ্ঞা দিন।

২. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্যসমূহ কী?

৩. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের কর্মক্ষেত্রগুলো কী?

৪. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সুবিধাগুলো কী?

৫. স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের অসুবিধাগুলো কী?